بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৩ জুন, ২০২৩ মোতাবেক ২৩ এহসান, ১৪০২ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

যেমনটি গত খুতবায় বর্ণিত হয়েছিল, মহানবী (সা.)-এর প্রেরিত গুপ্তচররা ফেরত এসে মহানবী (সা.)-কে একটি কাফেলা বা সৈন্যবাহিনীর আগমনের সংবাদ প্রদান করে। মহানবী (সা.) যখন এ সংবাদ পান যে, কুরাইশের সেনাবাহিনী (তাদের) বাণিজ্যিক কাফেলার সুরক্ষার জন্য এগিয়ে আসছে, তখন মহানবী (সা.) সাহাবীদের কাছে পরামর্শ চান এবং কুরাইশের অবস্থা সম্পর্কে তাদের অবগত করেন। তখন হযরত আবু বকর (রা.) দণ্ডায়মান হন এবং খুবই চমৎকার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এরপর হযরত উমর (রা.) দণ্ডায়মান হন, তিনিও খুবই সুন্দর অলোচনা করেন। অতঃপর হযরত মিকদাদ বিন আমর (রা.) দণ্ডায়মান হন এবং নিবেদন করেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে যেদিকে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন আপনি সেদিকেই এগিয়ে চলুন, আমরা আপনার সাথে আছি। খোদার কসম! আমরা আপনাকে সেই উত্তর দেবো না, যে উত্তর বনী ইসরাঈলীরা হযরত মূসা (আ.)-কে দিয়েছিল যে, فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (সূরা আল্ মায়েদা: ২৫) অর্থাৎ, 'যাও! তুমি এবং তোমার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ করো, আমরা এখানেই বসে থাকব।' বরং আমরা এভাবে বলব যে, আপনি ও আপনার প্রভু যান এবং যুদ্ধ করুন, আমরাও আপনার সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করব। সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! আপনি যদি আমাদেরকে **বারকুল গিমাদ** পর্যন্তও নিয়ে যান, তবুও আমরা আপনার সাথে যাব।" বারকুল গিমাদের ব্যাপারে লেখা আছে যে, এটি ইয়েমেনে অবস্থিত এবং মক্কা মুকাররমা থেকে পাঁচ মঞ্জিল দূরত্বে অবস্থিত। আরবদের মাঝে অনেক বেশি দূরত্ব বোঝানোর জন্য এই প্রবাদ ব্যবহার হতো। আর এরপর তিনি বলেন, আপনার সহযোদ্ধা হয়ে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করতে থাকব, যতক্ষণ না আপনি সেখানে পৌঁছে যান। মহানবী (সা.) তাকে উত্তম সম্ভাষণে ভূষিত করেন এবং তার জন্য দোয়া করেন।

একজন লেখক এটি লিখেছেন যে, **বারকুল গিমাদ** মক্কার দক্ষিণে মোটামুটি প্রায় ৪৩০ কি.মি. দূরত্বে সাধারণ যাতায়াত পথ থেকে দূরের একটি স্থান ছিল, যা পথের দূরত্ব ও পথ দুর্গম হওয়ার কারণে প্রবাদ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। যেমন উর্দূতে বলা হয় **'কোহে কাফ'** যা দূরত্বের বিষয়টি স্পষ্ট করে, অর্থাৎ যতদূর ইচ্ছা চলুন, আমরা আপনার সাথে থাকব। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, কতক জীবনীকার এ প্রেক্ষাপটে এই প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, হযরত মিকদাদ (রা.) এ উপলক্ষে যে আয়াত পাঠ করেছিলেন সেটি সূরা মায়েদার আয়াত আর এই সূরা অনেক পরে অবতীর্ণ হওয়া সূরা। তাই সে সময় এই আয়াত পাঠ করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত বিষয় নয়। কিন্তু এরপর এই তফসীরকারকগণ নিজেরাই এসংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। যেমন– হতে পারে তিনি বনী ইসরাঈলের কাছে অর্থাৎ ইহুদীদের কাছে এ কথা শুনে থাকবেন, অথবা হতে পারে পরবর্তীতে কোনো বর্ণনাকারী উক্ত আয়াত এতে অর্ন্তভুক্ত করে থাকবে। যাহোক, এই আপত্তি ততটা গুরুত্ব রাখে না, কেননা

জীবনচরিতের গ্রন্থাবলীতে অগণিত স্থানে উক্ত রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। অধিকন্তু বুখারী শরীফের তফসীর ফাতহুল বারী, যা ইবনে রজব-এর ব্যাখ্যা, তাতে একথা লেখা আছে যে, সম্পূর্ণ সূরা মায়েদা বিদায় হজ্জের সময় অবতীর্ণ হয়েছে– একথা সঠিক নয়; এর কতক আয়াত বেশ পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছিল। সেগুলোর মধ্য থেকেই একটি আয়াত হযরত মিকদাদ (রা.) বদরের যুদ্ধের সময় পাঠ করেছিলেন। কিন্তু যাহোক, ইহুদীদের কাছ থেকেই শুনেছিলেন– একথাটিও সঠিক হতে পারে।

অতঃপর বর্ণিত হয়েছে, এই তিনজন অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং হযরত মিকদাদ (রা.) মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ কারণে মহানবী (সা.) আনসারের মতামত জানতে চাচ্ছিলেন। অতএব মহানবী (সা.) বলেন, হে লোকেরা! আমাকে পরামর্শ দাও। তিনি (সা.) আনসারদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন। আর হয়ত এর কারণ এটিও হতে পারে যে, আকাবার বয়আতের সময় তারা নিবেদন করেছিল যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! নিঃসন্দেহে আমরা সে সময় পর্যন্ত আপনার বিষয়ে দায়মুক্ত যতক্ষণ আপনি আমাদের শহরে আগমন না করছেন; কিন্তু যখনই আপনি সেখানে অর্থাৎ মদীনায় আসবেন তখন আপনার দায়িত্ব আমাদের ওপর থাকবে। আমরা এমন প্রত্যেক জিনিস থেকে আপনার সুরক্ষা করব যা থেকে আমরা নিজেদের স্ত্রীসন্তানদের সুরক্ষা করে থাকি। এ কারণে মহানবী (সা.) এই আশঙ্কা করছিলেন যে, আনসাররা কোথাও আবার এটি মনে করছে না তো যে, তারা কেবল সেসব শত্রু থেকে তাঁর (সা.) সুরক্ষা করবে যারা মদীনা শরীফের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করবে আর হয়ত একথা ভাবছে যে, তাদের জন্য নিজেদের শহরের বাইরে গিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করা আবশ্যক নয়। কিন্তু মহানবী (সা.) যখন একথা বলেন তখন হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) তাঁর সমীপে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! মনে হচ্ছে আপনি আমাদের মতামত জানতে চাচ্ছেন। মহানবী (সা.) বলেন, অবশ্যই। তখন হযরত সা'দ (রা.) বলেন, নিঃসন্দেহে আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি। আমরা আপনার সত্যায়ন করেছি এবং আমরা এ সাক্ষ্য প্রদান করেছি যে, যে ধর্মসহ আপনি প্রেরিত হয়েছেন তা সত্য আর এর ভিত্তিতে আমরা আপনার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি। আমরা আপনার নির্দেশ শোনার ও তা মান্য করার দৃঢ় অঙ্গীকার করেছি। হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি যেদিকে চান সেদিকেই চলুন, আমরা আপনার সাথে আছি। সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন! আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্র তীরে নিয়ে যান এবং নিজে তাতে ঝাঁপ দেন তবে আমরাও আপনার সাথে সমুদ্রে ঝাঁপ দেবো; আমাদের মধ্যে একজনও পিছিয়ে থাকবে না। আমরা এটি অপছন্দ করি না যে, আপনি আগামীকাল আমাদের সাথে নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করবেন। আমরা যুদ্ধে ধৈর্যধারণকারী, শত্রুদের মোকাবিলা করার সময় বিশ্বস্ততা প্রদর্শনকারী। আমরা আশা করি, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মাধ্যমে আপনাকে সেই কার্যসিদ্ধি দেখাবেন যা দেখে আপনার চোখ প্রশান্ত হবে। অতএব ঐশী কল্যাণে সিক্ত হয়ে আপনি আমাদের নিয়ে যাত্রা করুন। সহীহ্ মুসলিমের একটি রেওয়ায়েতে এ শব্দগুলো হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)'র প্রতি আরোপিত হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত সা'দ বিন উবাদ (রা.) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। তাই জীবনীকাররা এভাবে এটির সমন্বয় করেছেন যে, হতে পারে দুবার সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করা হয়ে থাকবে। প্রথমবার যখন মদীনায় তিনি (সা.) কাফেলার সংবাদ পান তখন সেখানে হযরত উবাদা (রা.) এই বক্তব্য দিয়ে থাকবেন, আর দ্বিতীয়বার যখন তিনি (সা.) সফরে ছিলেন তখন পরামর্শ চাইলে সেসময় হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) একথা বলে থাকবেন। যাহোক,

এটি তো তফসীর যাতে বিভিন্ন ভাষ্যকার নিজ নিজ মন্তব্য লিখেছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা হলো, সা'দ বিন মুআয (রা.) একথা বলেছেন। হযরত সা'দ (রা.)'র একথা শুনে মহানবী (সা.) খুবই আনন্দিত হন এবং বলেন, যাত্রা করো এবং তোমাদের জন্য সুসংবাদ যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দুটি দলের মাঝে একটি দলের ওপর বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। খোদার কসম! আমি যেন এ মুহূর্তেই সেসব স্থান দেখতে পাচ্ছি যেখানে শত্রুপক্ষের লাশ পড়বে। তাঁর (সা.) একথা শুনে সাহাবীরা আনন্দিত হন, কিন্তু একই সাথে তারা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন যে, **هلا ذكرت لنا القتال فنستعد** (উচ্চারণ: **হাল্লা যাকারতা লানাল কিতালা ফানাসতাঈদ**) অর্থাৎ হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি যদি কুরাইশ বাহিনী সম্পর্কে পূর্বেই জানতেন তাহলে আপনি আমাদেরকে মদীনাতেই যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্পর্কে কেন অবগত করেননি? তাহলে আমরা কিছুটা প্রস্তুতি গ্রহণ করে বের হতে পারতাম। কিন্তু এ সংবাদ ও এই পরামর্শ সত্ত্বেও এবং মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে এই দুদলের মধ্য হতে কোনো একটি (দলের) ওপর মুসলমানদের অবশ্যই বিজয়ী হওয়া মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী থাকা সত্ত্বেও কোন দলের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ হবে তা তখনো অবধি নিশ্চিত ছিল না। তবে তারা এই দুই দলের মধ্য হতে কোনো একটি দলের সাথে লড়াই হবার সম্ভাবনার কথা জানতেন। আর স্বভাবতই দুর্বল দলের অর্থাৎ কাফেলার সাথে লড়াইয়ের বেশি আকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই বিষয়ে বলেন,

বদরের যুদ্ধের সময় যখন মদীনার বাহিরে যুদ্ধ হতে যাচ্ছিল তখন মহানবী (সা.) সকল সাহাবীকে একত্রিত করে বলেন, হে লোকেরা! আমাকে পরামর্শ দাও কেননা আমি জানতে পেরেছি কাফেলার সাথে আমাদের যুদ্ধ হবে না বরং মক্কার সৈন্যবাহিনীর সাথে আমাদের যুদ্ধ হবে। তখন একের পর এক মুহাজির দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি যুদ্ধ করুন, আমরা আপনার সাথে আছি। কিন্তু প্রতিবারেই কোনো মুহাজির দাঁড়িয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করে বসে গেলে মহানবী (সা.) বলতেন, হে লোকেরা, আমাকে আরো পরামর্শ দাও। তাঁর (সা.) মাথায় এ বিষয়টি ছিল যে, মুহাজিররা তো পরামর্শ দিচ্ছেই, মূল বিষয় হচ্ছে আনসারদের। আনসারদের নীরব থাকার কারণ হলো তাদের এই ধারণা যে, (বিপক্ষ) যোদ্ধারা হলো মক্কার মানুষ, (তাই) আমরা যদি মক্কার মানুষের সাথে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকার কথা বলি তাহলে সম্ভবত আমাদের এই কথা মুহাজিরদের পছন্দ হবে না। আর তারা (হয়তো) ভাববে, এসব লোকেরা আমাদের ভাই-বন্ধুদের হত্যা করার জন্য উৎসাহী হয়ে কথা বলছে। কিন্তু মহানবী (সা.) যখন বার বার বলেন, হে লোকেরা, আমাকে পরামর্শ দাও– তখন এক আনসার সাহাবী দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো পরামর্শ পাচ্ছেন। একের পর এক মুহাজির দাঁড়াচ্ছেন এবং তারা বলছেন, হে আল্লাহ্র রসূল, যুদ্ধ করুন! কিন্তু আপনি বার বার বলছেন যে, হে লোকেরা, আমাকে পরামর্শ দাও। আমি মনে করি, সম্ভবত আপনি আনসারের পরামর্শ চাচ্ছেন। মহানবী (সা.) বলেন, ঠিক বলেছ। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমাদের নীরব থাকা এই আশঙ্কার কারণে যে, পাছে আমাদের মুহাজির ভাইয়েরা আবার মনে কষ্ট না পান আর আমরা যদি বলি, আমরা লড়াই করার জন্য প্রস্তুত– তাহলে পাছে তাদের হৃদয়ে এই ধারণা জন্মে যে, এরা আমাদের ভাই-বেরাদর এবং আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করার পরামর্শ দিচ্ছে। এরপর তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! সম্ভবত আপনি আকাবার সেই বয়আতের দিকে ইঙ্গিত করছেন যখন আমরা এই মর্মে অঙ্গীকার করেছিলাম যে, মদীনার ওপর যদি কোনো শত্রু আক্রমণ করে তাহলে

আমরা আপনাকে সাহায্য করব। কিন্তু যদি মদীনার বাহিরে গিয়ে যুদ্ধ করতে হয় তাহলে আমাদের জন্য কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না। মহানবী (সা.) বলেন, ঠিক, এটিই আসল কথা। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা যখন সেই অঙ্গীকার করেছিলাম তখন আমরা আপনার মর্যাদা সম্পর্কে যথাযথরূপে অবগত ছিলাম না। হে আল্লাহ্‌র রসূল! এখন আপনার সত্যতা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট এবং আপনার মর্যাদা আমাদের ভালোভাবে জানা হয়ে গেছে। এখন কোনো চুক্তির কোনো গুরুত্বই নেই। সামনে সমুদ্র রয়েছে, আপনি নির্দেশ দিলে আমরা এতে ঘোড়াসহ ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। আর যদি কোনো যুদ্ধ হয় তাহলে আল্লাহ্‌র কসম, আমরা আপনার ডানে লড়ব, বামে লড়ব, সামনে লড়ব এবং পেছনেও লড়ব, আর আমাদের লাশ মাড়িয়ে না আসা পর্যন্ত শত্রু আপনার কাছে পৌঁছতে পারবে না ।

এই পরামর্শের পর মহানবী (সা.) সেখান থেকে যাত্রা করেন এবং বিভিন্ন পথ পাড়ি দিয়ে বদরের নিকটে শিবির স্থাপন করেন। বদর সম্পর্কে বিস্তারিত পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু (এখানেও) বলে দিচ্ছি যে, মদীনার দক্ষিণ পশ্চিমে একশ পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরত্বে এটি অবস্থিত। এটি ডিম্বাকৃতির সাড়ে পাঁচ মাইল দীর্ঘ এবং চার মাইল প্রস্থের বিস্তৃত মরুপ্রান্তর যার চতুষ্পার্শ্বে উঁচু পাহাড় রয়েছে। এখানে বেশ কয়েকটি কূপ এবং বাগানও ছিল যেখানে সাধারণত বিভিন্ন কাফেলা যাত্রা-বিরতি করতো। বদরের নিকটে শিবির স্থাপন করার কিছুক্ষণ পর তিনি (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) বাহনে চড়ে বের হন এবং একজন আরব বৃদ্ধের নিকট গিয়ে থামেন এবং তার কাছে নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে কুরাইশ (দল) এবং মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। সেই বৃদ্ধ বলে, আমি তোমাকে তখনই বলব যখন তোমরা আমাকে একথা বলবে যে, তোমরা কোন গোত্রের সদস্য। মহানবী (সা.) বলেন, যখন তুমি আমাদেরকে বলবে তখন আমরাও তোমাকে আমাদের সম্পর্কে অবগত করব, নিজেদের সম্পর্কে বলব। সে বলে, তথ্যের বিনিময়ে তথ্য দেবে? মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ। (তখন) বৃদ্ধ বলে, আমি জানতে পেরেছি যে, মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা অমুক অমুক দিন রওয়ানা হয়েছেন। যদি আমাকে সংবাদদাতা সত্য বলে থাকে তবে তারা আজ অমুক স্থানে থাকবে। সে সেই স্থানের নাম বলে যেখানে মহানবী (সা.) পৌঁছেছিলেন। এরপর (সে) আরো বলে, আমি এটিও জানতে পেরেছি যে, কুরাইশরা অমুক দিন রওয়ানা হয়েছে। যদি আমাকে সংবাদ প্রদানকারী সত্য কথা বলে থাকে তবে আজ তারা অমুক স্থানে আছে। সে সেই স্থানের নাম উল্লেখ করে যেখানে কুরাইশরা পৌঁছেছিল। উভয় কথাই সে সঠিক বলেছিল। যখন সে তার সংবাদ দেওয়া শেষ করে তখন সে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কোত্থেকে? মহানবী (সা.) বলেন, আমরা পানি থেকে। যখন মহানবী (সা.) তার কাছ থেকে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন সে বলে, পানি থেকে! এর অর্থ কী? (তোমরা) কি ইরাকের পানি থেকে? তাঁর (সা.) এই উত্তর দ্ব্যর্থবোধক মনে হয়। এ সম্পর্কেও ঐতিহাসিকগণ কথা বলেছেন। আমাদের যারা উদ্ধৃতি খুঁজে বের করেন তারা এ বিষয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন (যার) সারমর্ম বলে দিচ্ছি। ঐতিহাসিকগণ এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, বাহ্যত মনে হয়, মহানবী (সা.) কৃত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সঠিক উত্তর প্রদান করেন নি। লেখকরা এর উত্তর এভাবে প্রদান করে থাকেন যে, মহানবী (সা.) তাকে ভুল উত্তর দেন নি। তবে হ্যাঁ, তিনি (সা.) এর একাধিকার্থক উত্তর প্রদান করেছেন যা মিথ্যাও নয়, আবার সেই বিরাজমান ভয়ংকর যুদ্ধের পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট স্থানের কথাও বলেন নি। কেননা মহানবী (সা.)-এর উক্তি 'আমরা পানি থেকে' বলতে কুরআনের সেই ভাষ্য

অর্থাৎ, **'আমরা প্রত্যেক জীবিত বস্তুকে পানি হতে সৃষ্টি করেছি'** –বুঝিয়েছেন। একজন জীবনীকার আবু বকর জাবের আল্ জাযায়েরী একথা লিখেছেন।

একজন বলেন, আরবের রীতি এটি ছিল যে, যেখানে মানুষ বসবাস করতো সেস্থানের ঠিকানা সেখানকার পানি অর্থাৎ ঝরনা ইত্যাদির নামের বরাতে বলতো। অর্থাৎ আমরা অমুক পানি অথবা অমুক অঞ্চলের পানির সাথে সম্পর্ক রাখি। আল্লামা বুরহান হালাবী এটি লিখেছেন। আরেকটি ব্যাখ্যা এটিও হতে পারে যে, তিনি (সা.) বদরের সেই ঝরনার নাম-ই বলেছিলেন যার নিকটে তিনি (সা.) অবস্থান করছিলেন, যেমনটি সেই বৃদ্ধ বলেছিল। কিন্তু হয়তো এমনভাবে ইঙ্গিত করে থাকবেন যে, সেই বৃদ্ধ ইরাকের দিকে মনে করেছিল আর বদরের সেই ঝরনা এবং ইরাক (হয়তো) একই দিকে ছিল। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন। এরপর মহানবী (সা.) সাহাবীদের কাছে ফেরত আসেন। এরপর সন্ধ্যা নেমে এলে মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.), হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) এবং হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.)-কে আরো কয়েকজন সাহাবীর সাথে বদরের ঝরনা অভিমুখে প্রেরণ করেন যেন তাঁরা সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। (সেখানে) তাঁরা কুরাইশের জন্য পানি বহনকারী দুজন ক্রীতদাসের দেখা পান। সাহাবীরা তাদেরকে ধরে নিয়ে আসেন এবং জিজ্ঞাসাবাদ করেন। মহানবী (সা.) তখন নামায পড়ছিলেন। তারা উভয়ে বলে, আমরা কুরাইশের জন্য পানি বহনকারী; তারা আমাদেরকে পানি নেয়ার জন্য পাঠিয়েছে। সাহাবীরা তাদের কথা বিশ্বাস করেন নি এবং ধারণা করেন, এরা সম্ভবত আবু সুফিয়ানের কর্মচারী। তাই সাহবীরা তাদেরকে মারধোর করেন। যখন তাদেরকে কঠিন প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেন তখন তারা বলে বসে যে, আমরা আবু সুফিয়ানের কর্মচারী, কেবল তবেই সাহাবীরা তাদেরকে (মারধোর) বন্ধ করেন। সালাম ফেরানোর পর মহানবী (সা.) বলেন, যখন তারা উভয়ে তোমাদেরকে সত্য বলেছে তখন তোমরা তাদেরকে প্রহার করেছ, আর যখন তারা মিথ্যা বলেছে তখন তোমরা তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছ। খোদার কসম! তারা সত্য বলেছে। তারা যে কুরাইশের ক্রীতদাস এতে কোনো সন্দেহ নেই। এরপর তিনি তাদের উভয়ের দিকে ফিরে বলেন, তোমরা আমাকে কুরাইশ সম্পর্কে বলো। তারা উভয়ে বলে, আল্লাহ্‌র শপথ! তারা এই টিলার পেছনে উপত্যকার অপর প্রান্তে শিবির স্থাপন করেছে। এরপর মহানবী (সা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তারা সংখ্যায় কত? তারা উত্তরে বলে, অনেক। জিজ্ঞেস করা হয়, তাদের সংখ্যা কত? তারা বলে, আমরা জানি না। তিনি (সা.) বলেন, তারা খাওয়ার জন্য দৈনিক কতটি উট জবাই করে। তারা উত্তরে বলে, কোনো দিন নয়টি আবার কোনো দিন দশটি। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তারা নয়শ' থেকে এক হাজার হবে। তিনি (সা.) উট জবাই করে খাওয়ার হিসাব থেকে অনুমান করেছেন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তাদের মাঝে কুরাইশদের নেতৃস্থানীয়দের কে কে আছে? তারা কুরাইশের বেশ কয়েকজন নেতার নাম বলে যাদের মধ্যে আবু জাহল, উতবা, শায়বা, হাকীম বিন হিযাম এবং উমাইয়্যা বিন খালাফ প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপর মহানবী (সা.) উপস্থিত লোকদের সম্বোধন করে বলেন, **هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ أكبادها** (উচ্চারণ: **হাযিহি মাক্কাতু কাদ আলকাত ইলাইকুম আফলাযা আকবাদেহা**) অর্থাৎ মক্কা তোমাদের সামনে তাদের কলিজার টুকরা বের করে রেখে দিয়েছে।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)-ও এ প্রসঙ্গে লিখেছেন,

মহানবী (সা.) সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেন, **হাযিহি মাক্কাতু কাদ আলকাত ইলাইকুম আফলাযা আকবাদেহা** অর্থাৎ দেখো! মক্কা তোমাদের সামনে তাদের কলিজার টুকরা বের করে রেখে দিয়েছে। এটি খুবই বুদ্ধিদীপ্ত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বাক্য ছিল যা মহানবীর পবিত্র মুখ থেকে অবলীলায় বেরিয়েছে। কেননা, কুরাইশের এত সংখ্যক নামীদামী নেতৃবৃন্দের উল্লেখ করা হলে দুর্বল প্রকৃতির মুসলমানরা মনোবল হারাতে পারত। তা না হয়ে এ বাক্য তাদের চিন্তাচেতনার প্রবাহ এদিকে পরিচালিত করেছে যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন এসব কুরাইশ নেতাকে মুসলমানদের শিকারে পরিণত হওয়ার জন্য প্রেরণ করেছেন।

এরপর মহানবী (সা.) তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাত্রা শুরু করেন যেন মুশরিকদের পূর্বেই বদরের ঝরনায় পৌঁছে যেতে পারেন, মুশরিকরা যেন তা দখল করতে না পারে। যাহোক, এশার নামাযের সময় তিনি বদরের নিকটবর্তী ঝরনার কাছে অবস্থান নেন। এপর্যায়ে হযরত হুবাব বিন মুনযের একটি পরামর্শ দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) যখন বদরের নিকটবর্তী ঝরনার পাশে শিবির স্থাপন করেন তখন হুবাব বিন মুনযের (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কি আল্লাহ্‌র নির্দেশে এ জায়গায় শিবির স্থাপন করেছেন? অর্থাৎ যদি তাই হয় তাহলে আমরা এরচেয়ে সামনেও যেতে পারবো না আর এরচেয়ে পেছনেও যেতে পারবো না; নাকি এটি নিছক আপনার মত এবং রণকৌশল? হুযূর (সা.) বলেন, এটি নিছক (আমার) নিজস্ব মত আর রণকৌশল। তখন হযরত হুবাব (রা.) নিবেদন করেন, এটি উপযুক্ত জায়গা নয়, আপনি বরং লোকদেরকে এখান থেকে সরিয়ে সেস্থানে শিবির স্থাপন করুন যা শত্রুদের তুলনায় ঝরনার সবচেয়ে নিকটতম স্থান হবে। এছাড়া অন্য সব কূপ বন্ধ করে দেয়া হোক এবং নিজেদের জন্য একটি চৌবাচ্চা বানিয়ে তা পানি দিয়ে ভরে রাখা হোক। এরপর আমরা যদি শত্রুর সাথে যুদ্ধ করি তাহলে পান করার জন্য আমাদের কাছে পানি থাকবে আর শত্রুরা পানি থেকে বঞ্চিত থাকবে। মহানবী (সা.) বলেন, তোমার পরামর্শ খুবই উত্তম। এরপর তিনি (সা.) সৈন্যদের নিয়ে ঝরনায় আসেন এবং সেখানে অবস্থান গ্রহণ করেন যা কুরাইশের চেয়ে ঝরনার নিকটতর ছিল। আর মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে অন্য কূপগুলো অকার্যকর করে দেয়া হয়। আর যে কূপের কাছে শিবির স্থাপন করা হয় সেখানে একটি চৌবাচ্চা বানিয়ে তা পানি দিয়ে ভরে দেয়া হয়। এ বিবরণ সীরাত ইবনে হিশামে রয়েছে।

স্থান নির্বাচনের পর ছিল মহানবী (সা.)-এর অবস্থানস্থল প্রস্তুত করার কাজ। অতএব অওস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মুআয (রা.)'র পরামর্শে সাহাবীরা ময়দানের এক প্রান্তে মহানবী (সা.)-এর জন্য একটি ছাউনি প্রস্তুত করেন। হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা কি আপনার অবস্থানের জন্য একটি শামিয়ানা তৈরি করব? এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) যে বিস্তারিত চিত্র অঙ্কন করেছেন তা পূর্বেও একবার বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু এখানেও বর্ণনা করা আবশ্যক।

অওস গোত্রের নেতা হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)'র পরামর্শে সাহাবীরা ময়দানের এক প্রান্তে মহানবী (সা.)-এর জন্য একটি ছাউনি তৈরি করেন এবং হযরত সা'দ মহানবী (সা.)-এর বাহন ছাউনির পাশে বেঁধে রেখে নিবেদন করেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি এই ছাউনিতে অবস্থান করুন, আমরা আল্লাহ্ তা'লার নাম নিয়ে শত্রুদের মোকাবিলা করতে যাচ্ছি। যদি আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বিজয় দান করেন তাহলে এটিই আমাদের কাম্য। কিন্তু আল্লাহ্ না করুন, যদি পরিস্থিতি ভিন্ন হয় আর আমরা পরাজিত হই তাহলে

আপনি আপনার বাহনে চড়ে যেভাবেই হোক মদীনায় পৌঁছে যাবেন। সেখানে আমাদের এমন ভাই-বন্ধু রয়েছে যারা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় আমাদের চেয়ে পিছিয়ে নেই। কিন্তু তারা যেহেতু জানে না যে, এই অভিযানে যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে– তাই তারা আমাদের সাথে আসেনি, তা না হলে তারা কখনো পেছনে থাকতো না। কিন্তু যখন তারা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হবে তখন তারা আপনার নিরাপত্তায় নিজেদের জীবন বাজি রাখতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। এটি হযরত সা'দ (রা.)'র আন্তরিকতার আতিশয্য যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু কেউ খোদা তা'লার রসূল হবেন আবার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করবেন– এটি কীভাবে সম্ভব! যেমন হুনায়নের রণক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, মুসলমানদের বারো হাজার সৈন্যবিশিষ্ট সেনা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলেও তৌহীদের প্রাণকেন্দ্র মহানবী (সা.) দোদুল্যমান হননি।

যাহোক, একটি ছাউনি তৈরি করা হয়। হযরত সা'দ (রা.) এবং অন্যান্য আনসার সাহাবীগণ তার চতুষ্পার্শ্বে পাহারা দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে যান। মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) এই ছাউনিতেই রাত্রিযাপন করেন। একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) এই ছাউনিতেই নগ্ন তরবারি হাতে মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তার জন্য তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন আর মহানবী (সা.) সারা রাত আল্লাহ্ তা'লার সকাশে ক্রন্দন ও আহাজারি করে দোয়া করতে থাকেন। এটিও লেখা হয়েছে যে, পুরো সেনাবাহিনীতে কেবলমাত্র তিনি (সা.)ই সারা রাত জেগে কাটান আর অন্য সবাই পালাক্রমে কিছুটা হলেও ঘুমিয়ে নেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, 'বদরের প্রান্তরে পৌঁছালে সাহাবীরা একটি চাতালের মতো বানিয়ে মহানবী (সা.)-কে সেখানে বসান। এরপর তারা পরস্পর পরামর্শ করেন যে, সবচেয়ে বেশি গতিসম্পন্ন উটনী কার কাছে রয়েছে? এরপর সবচেয়ে দ্রুত গতিসম্পন্ন একটি উটনী নিয়ে তারা মহানবী (সা.)-এর আবাসনের নিকটে বেঁধে রাখেন। মহানবী (সা.) সেটিকে দেখার পর বলেন, এটি এখানে কেন? উত্তরে তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা সংখ্যায় অল্প আর শত্রুরা সংখ্যায় বেশি। আমাদের আশঙ্কা হয়, পাছে আমরা সবাই এখানে শহীদ হয়ে যাই! হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা আমাদের মৃত্যু নিয়ে চিন্তিত নই বরং আমাদের চিন্তা আপনাকে নিয়ে, পাছে আপনার কোনো ক্ষতি হয়ে যায়। আমরা মারা গেলে ইসলামের কোনো ক্ষতি হবে না কিন্তু আপনার সাথে ইসলামের জীবনের সম্পর্ক। তাই আপনার নিরাপত্তা বিধান করা আমাদের জন্য আবশ্যক। হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা আপনার নিরাপত্তার জন্য হযরত আবু বকর (রা.)-কে নিযুক্ত করেছি আর এই যে অত্যন্ত দ্রুত গতিসম্পন্ন একটি উটনী, যা আপনার কাছে বেঁধে রেখেছি। আল্লাহ্ না করুন, যদি আমাদের একের পর এক এখানে মারা যাওয়ার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহলে হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই উটনীটি এখানে রইল, এটিতে চড়ে আপনি মদীনায় পৌঁছে যাবেন, সেখানে আমাদের ভাইয়েরা আছে। তারা একথা জানতো না যে যুদ্ধ হতে পারে, যদি তারা জানতো তাহলে তারাও আমাদের সাথে যোগদান করতো। আপনি তাদের কাছে পৌঁছে যাবেন; তারা আপনার নিরাপত্তা বিধান করবে আর আপনি শত্রুর অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবেন। কিন্তু যাহোক, মহানবী (সা.) তো তাদের একথা মানার লোক ছিলেন না আর তিনি (সা.) এটি মানতেও পারতেন না। তবে এটি ছিল সেসব সাহাবীর আবেগের বহিঃপ্রকাশ।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ প্রসঙ্গে বলেন,

হযরত আলী (রা.) একবার বলেন, সাহাবীদের মাঝে সবচেয়ে বেশি সাহসী ও বীর ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)। বদরের যুদ্ধের সময় যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জন্য একটি পৃথক তাঁবু (উচু স্থানে) নির্মাণ করা হয় তখন এই প্রশ্ন সামনে আসে যে, আজকে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিরাপত্তার দায়িত্ব কার ওপর ন্যস্ত করা যায়? তখন হযরত আবু বকর (রা.) তৎক্ষণাৎ নগ্ন তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং তিনি এই চরম বিপদের সময় পরম সাহসিকতার সাথে তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন।

যাহোক, ভোরবেলা কুরাইশরা নিজেদের অবস্থানস্থল ছেড়ে এগিয়ে আসে। মহানবী (সা.) তাদেরকে দেখে বলেন, হে আল্লাহ্! কুরাইশরা অহংকার ও দাম্ভিকতার সাথে তোমার সাথে যুদ্ধ করতে এবং তোমার রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য এসেছে। তুমি আমার সাথে সাহায্যের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছো তা পূর্ণ করো আর আজই তাদের ধ্বংস করো। মুশরিকদের মাঝে মহানবী (সা.) উতবা বিন রবীয়াকে একটি লাল বর্ণের উটে আরোহিত দেখতে পান। তিনি (সা.) বলেন, যদি তাদের কারো মাঝে মঙ্গল থেকে থাকে তাহলে কেবল এই লাল উষ্ট্রারোহীর কাছেই রয়েছে। তারা যদি তার কথা শুনে তাহলে সঠিক পথে চলে আসবে।

রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চৌবাচ্চা থেকে কাফেরদের পানি পান করার ঘটনা পাওয়া যায়। যদিও পানির ওপর মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ ছিল, কিন্তু কুরাইশরা যখন বদরের প্রান্তরে অবস্থান নেয় তখন তাদের মাঝ থেকে একটি দল মহানবী (সা.)-এর জলাধারে এসে পানি পান করতে থাকে। এদের মাঝে হাকীম বিন হিযামও ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, এদেরকে পানি পান করতে দাও। সেদিন এ জলাধার থেকে যারাই পানি পান করেছিল তাদের সবাই নিহত হয় শুধু হাকীম বিন হিযাম ছাড়া। হাকীম বিন হিযাম পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। সে যখন শপথ নিত তখন এভাবে বলতো যে, সেই সত্তার কসম, যিনি বদরের যুদ্ধের দিন আমাকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

যুদ্ধের জন্য সারি বিন্যস্ত করা সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, ভোরবেলা কুরাইশদের আসার পূর্বে তিনি (সা.) সাহাবীদের সারিবদ্ধ করেন। তিনি (সা.) তিরের মাধ্যমে সারি বিন্যস্ত করছিলেন। তিনি এর মাধ্যমে ইশারা করছিলেন (আর বলছিলেন) সামনে আসো, পেছনে যাও, যতক্ষণ না সারি সোজা হয়। তিনি (সা.) হযরত মুসআব বিন উমায়েরকে (রা.) পতাকা প্রদান করেন যা তিনি সেই স্থানে রাখেন যেখানে রাখার নির্দেশ তিনি (সা.) দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) সারিগুলো পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি তখন পশ্চিমমুখি ছিলেন। এই পুরো সময়ে, অর্থাৎ মহানবী (সা.) যখন সারি বিন্যস্ত করছিলেন তখন একটি বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যেটি হযরত সওয়াদ বিন গাযিয়্যা (রা.)'র ঘটনা, যার মাধ্যমে রসূলপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ইতিহাসে লেখা আছে যে, বদরের যুদ্ধে সারি ঠিক করার সময় যখন মহানবী (সা.) সওয়াদ বিন গাযিয়্যা (রা.)'র পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি সারির বাইরে ছিলেন। তিনি (সা.) তার পেটে তির লাগিয়ে ইশারা করেন আর বলেন, হে সওয়াদ! সোজা হয়ে দাঁড়াও। হযরত সওয়াদ (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি আমাকে কষ্ট দিয়েছেন। আপনাকে আল্লাহ্ তা'লা ন্যায়বিচারের সাথে প্রেরণ করেছেন। আপনি আমার পেটে তিরের আঘাত করেছেন, আপনি আমাকে প্রতিশোধ নিতে দিন। মহানবী (সা.) নিজের পেট থেকে কাপড় সরান আর বলেন, প্রতিশোধ নাও। হযরত সুওয়াদ (রা.) তাঁকে আলিঙ্গন করেন এবং তাঁর শরীরে চুমু খেতে থাকেন। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, হে সওয়াদ! তুমি কেন এমনটি করলে? তিনি (রা.) নিবেদন করেন,

হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কী (ভয়াবহ) এক অবস্থা বিরাজ করছে তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। যুদ্ধক্ষেত্র, জানি না আমি বেঁচে থাকব কি না। আমি চাইলাম, আমার জীবনের অন্তিম মুহূর্তগুলোয় আমার দেহ আপনার পবিত্র দেহকে স্পর্শ করুক। মহানবী (সা.) তাঁর মঙ্গলের জন্য দোয়া করেন। এই ছিল ভালোবাসা ও প্রেমের (নয়নাভিরাম) দৃশ্য। বাকি ইনশাআল্লাহ্‌ আগামীতে বর্ণনা করব।

এখন কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করতে চাই যাদের মাঝে একজন হলেন শ্রদ্ধেয় ক্বারী মুহাম্মদ আশেক সাহেব, যিনি জামেয়া আহমদীয়ার সম্মানিত শিক্ষক ছিলেন এবং মাদরাসাতুল হিফয-এর নিগরান ও প্রিন্সিপাল ছিলেন। তিনি কয়েকদিন পূর্বে ৮৫ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্‌ তা'লার কৃপায় তিনি একজন মূসী ছিলেন। ক্বারী আশেক সাহেব পবিত্র কুরআন হিফয এবং তাজবীদ শেখার পর (আহমদীয়াত গ্রহণ করার পূর্বে) পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় আহলে হাদীসের মাদরাসায় পঠন-পাঠনের সুযোগ পান। তিনি নিজেই বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। ক্বারী আশেক সাহেব বয়আত গ্রহণের পূর্বে আহলে হাদীস সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ক্বারী সাহেব আত্মজীবনী পুস্তিকায় লিখিয়েছিলেন যে, ১৯৫৭ সালের ঘটনা, আমি যখন করাচিতে ছিলাম তখন সেখানকার কতক জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে আমার ওঠাবসা ছিল। আমি অধিকাংশ সময় তাদের কাছে চলে যেতাম। সেখানে পত্রিকা পড়তাম আর কতক আলেমের সাথে বৈঠকও হতো। একদিন আমি সেখানে বসে পত্রিকা পড়ছিলাম। তখন এক বন্ধু যিনি হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.)-এর কোনো বই অধ্যয়ন করছিলেন তিনি বলে উঠলেন, কী চমৎকার! আমি বললাম, চমৎকার কী? তখন তিনি বললেন, আমাদের সম্মানিত আলেমরা কুরআনের কতিপয় আয়াতের নাসেখ-মনসুখ হওয়ায় বিশ্বাসী, অথচ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেব বলে যে, কুরআনের এক বিন্দু-বিসর্গও মনসুখ নয়। ক্বারী সাহেব বলেন, এ কথায় আমি অনুসন্ধিৎসু হয়ে পড়ি। আমি ভাবলাম, এ বিষয়টি গবেষণা করে দেখা যাক যে, তিনি কি সত্য নাকি মিথ্যা। এরপর তিনি আত্মজীবনীতে লিখিয়েছেন যে, একদিন আমি আহমদীয়াতের বিষয়ে জানার জন্য নামাযের পর করাচির আহমদীয়া হলে গেলাম এবং সেখানে এক আহমদীর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি তাকে বললাম, যেসব বিষয়ে (আহমদী ও অ-আহমদীদের মাঝে) বিতর্ক রয়েছে সেসব বিষয়ে কিছু জানতে চাই, এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করা হোক। সেখানে বসা এক ব্যক্তি আমাকে আহমদীয়া হল থেকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। তিনি আমাকে কিছু বইপত্র পড়তে দেন। আমি সেগুলো পড়ি আর আমার সেই জ্ঞানী বন্ধুদের মাঝ থেকে এক মৌলভী সাহেবকে দেখাই যে, এটিই তো প্রকৃত ইসলাম। মৌলভী সাহেব বলেন, আপনি খুব ভদ্র ও সরল মানুষ। আপনার হয়ত জানা নেই, তাই আমি আপনাকে বলছি, মির্যা সাহেবের ছোট ছোট পুস্তিকায় যেসব আকীদা লেখা আছে তা ইসলামসম্মত। এগুলো সেসব কিতাবের মাঝে অন্তর্ভুক্ত যা তিনি প্রাথমিক যুগে লিখেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে যেসব বড় বড় পুস্তক লিখেছেন সেগুলোতে মির্যা সাহেব মিথ্যা ধ্যানধারণা এবং বিশ্বাস লিখে রেখেছেন। [অথচ বারাহীনে আহমদীয়া তো প্রারম্ভিক যুগেই লেখা হয়েছিল আর সেটিই ছিল ইসলামের মূল, আর পরবর্তীতেও তিনি বিভিন্ন বইপুস্তক লিখেছেন]। যাহোক ক্বারী সাহেবের সাথে যার সুসম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, ক্বারী সাহেব পুনরায় তার কাছে যান এবং তাকে বলেন, আমাকে কোনো বড় পুস্তক দিন। কিন্তু তিনি বড় পুস্তক দেয়ার ক্ষেত্রে কোনো অজুহাত দেখান, অথচ হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকগুলোতে কোনো স্ববিরোধ নেই; তা প্রাথমিক যুগের

পুস্তক হোক আর শেষের দিকের বা পরবর্তীতে লেখা কোনো পুস্তকই হোক। সেই আহমদী কোন প্রজ্ঞার অধীনে তাকে (তথা ক্বারী সাহেবকে) বড় পুস্তক দেননি আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। কিন্তু যাহোক, তার সাথে ক্বারী সাহেবের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর ক্বারী সাহেবের আত্মজীবনী অনুযায়ী জানা যায়, ঐশী তকদীর তার হৃদয়ে একপ্রকার বিশেষ উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল এবং ক্বারী সাহেব অসংখ্যবার রাবওয়া আসতে থাকেন আর স্থানীয় আহমদী সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রাখেন এবং অনেক দোয়াও অব্যাহত রাখেন। এসব দোয়ার মাঝেই তিনি বেশ কয়েকটি স্বপ্নও দেখেন। এসব স্বপ্নের মাঝে একটি স্বপ্ন ছিল "ইসমাউ সাওতাস সামা' জাআল মসীহ্"। অর্থাৎ আকাশবাণী শোনো, মসীহ্ এসে গেছেন। ক্বারী সাহেব বলেন, তখন এসব বাক্যের মাধ্যমে আহমদীয়াতের দিকে আমার মনোযোগ নিবদ্ধ হয়নি; কিন্তু আহমদী হওয়ার পর স্মরণ হয় যে, আমার সেই স্বপ্ন তো পূর্ণ হয়েছে! তিনি বিভিন্ন স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেগুলোর মাঝে এটিও একটি স্বপ্ন ছিল। ক্বারী সাহেব লেখেন, আমি যখন আমার জীবনের ঘটনাবলীর দিকে দৃষ্টি দেই তখন আমি ভাবি যে, এটি শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ছিল যে, আমার মনোযোগ বারবার আহমদীয়াতের প্রতি নিবদ্ধ হতে থাকে আর অবশেষে আমি হেদায়েত পাই।

তিনি আরও লেখেন, আনসারুল্লাহ্‌র ইজতেমায় লাহোরের মুরব্বী সিলসিলাহ শেখ আব্দুল কাদের সাহেব সওদাগরমল-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। ইজতেমার প্রথম দিন আনসারুল্লাহ্‌র ইজতেমায় যাই, (তখনও তিনি বয়আত গ্রহণ করেননি;) প্রথম দিনের সকল অনুষ্ঠান দেখি। ইজতেমার দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন আমি আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করি যে, আমার বয়আত নেয়া হোক। এরপর আমি কেন্দ্রীয় ইসলাহ ও ইরশাদ দফতরে যাই আর বয়আত ফর্ম পূরণ করে আহমদীয়াতের আলোয় আলোকিত হই।

আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর তাকে বহু পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছে। অন্যদিকে তার অ-আহমদী শিষ্য এবং নেতাদের পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে তাকে ফেরত নেয়ার চেষ্টা করা হয়, বিভিন্ন প্রলোভনও দেখানো হয়, অনেক কঠোরতাও প্রদর্শন করা হয়।

ক্বারী সাহেব বলেন, আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর আমার পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাকে (আহমদীয়াতে) অবিচল রাখেন এবং আমি তাঁর নির্দেশিত পথে চলতে থাকি। আল্লাহ্ তা'লার পথনির্দেশ আমার সহায় ছিল তাই জাগতিক কোনো প্রলোভন আমাকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে আমার হৃদয়ে ঘৃণা সৃষ্টি করতে এবং পুনরায় আহলে হাদীসের মাঝে ফেরত নিয়ে যাওয়ার অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা হয়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ঈমানের যে রঙে আমি রঙিন হয়েছিলাম এর ফলে শত চেষ্টা সত্ত্বেও তারা আমাকে ফেরত নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়।

এক বিধবার সাথে তার বিবাহ হয় যিনি পূর্বেই তিন সন্তানের জননী ছিলেন। তার ঔরসে এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়।

জামা'তী সেবামূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তিনি লেখেন, সূফী খোদা বখশ যিরভি সাহেবের সাথে একদিন মসজিদে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে বলেন, হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব (যিনি সে-সময় ওয়াকফে জাদীদের ইনচার্জ ছিলেন) খবর পাঠিয়েছেন, আপনাকে যেন রাবওয়াতে তাঁর কাছে নিয়ে যাই। (তখন তিনি বয়আত করে নিয়েছিলেন)। তিনি বলেন, আমি যখন তাঁর সমীপে উপস্থিত হই তখন মিয়া সাহেব প্রথমে আমার তিলাওয়াত শোনেন, এরপর ওয়াকফে জাদীদের মোয়াল্লেম সাহেবদেরকে

তাজবীদসহ কুরআন পড়ানোর জন্য আমাকে দায়িত্ব দেন এবং ওয়াকফে জাদীদ দফতরেই থাকার বন্দোবস্ত করে দেন। এটি ১৯৬৪ সালের ঘটনা। ১৯৬৫ সালের ০১ জানুয়ারি ক্বারী সাহেবের ওয়াকফে জাদীদ মোয়াল্লেম হিসেবে নিযুক্তি হয়। একইভাবে জামেয়া আহমদীয়ার শাহেদ ক্লাসের ছাত্ররা তার কাছে পবিত্র কুরআন পড়ার জন্য ওয়াকফে জাদীদ দফতরে আসতো। আর পরবর্তীতে জামেয়া আহমদীয়ার প্রিন্সিপাল মোহতরম মীর দাঊদ সাহেবের নির্দেশ অনুযায়ী ক্বারী সাহেব জামেয়া আহমদীয়াতে গিয়ে পড়ানো শুরু করেন। এর পাশাপাশি জামেয়া নুসরাত গার্লস কলেজে (এটি জামা'তের কলেজ ছিল) পর্দার শর্ত বজায় রেখে মেয়েদেরও তিনি কুরআন শরীফ পড়াতেন।

১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে রাবওয়ার হাফেয ক্লাসের ইনচার্জ হাফেয শফীক্ব সাহেবের মৃত্যু হলে জামেয়া আহমদীয়ার প্রিন্সিপাল মোহতরম মীর দাঊদ সাহেব হাফেয সাহেবকে বলেন, (হিফয) ক্লাসে গিয়ে ক্লাস নিন। সেই দিনগুলোতে মসজিদে মুবারকেও একটি ক্লাস হতো। আমারও স্মরণ আছে, ছেলেরা মসজিদে বসে বসে হিফয তথা পবিত্র কুরআন মুখস্ত করতো। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) পরে ক্বারী সাহেবকে হাফেয ক্লাসে নিযুক্তি প্রদান করেন, অর্থাৎ মঞ্জুরী প্রদান করেন আর একই সাথে আরো লেখেন, তিনি ওয়াকফে জাদীদেও পড়াবেন আর হাফেয ক্লাসেও পড়াবেন। অতএব ১৯৭১ সনের ১১ জুন হাফেয ক্লাসে রীতিমতো তার নিযুক্তি দেয়া হয়। ১৯৯৮ সনে তিনি অবসরে যান, তথাপি তিনি ২০১৯ পর্যন্ত মাদ্রাসাতুল হিফয এবং মাদ্রসাতুয জাফরে পবিত্র কুরআন পড়ানোর কাজ অব্যাহত রাখেন। ১৯৬৪ সনের বরকতময় জলসা সালানায় তিনি প্রথমবারের মতো তিলাওয়াত করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

ক্বারী সাহেব নিজের ঘটনা লিখতে গিয়ে বলেন, ১৯৬৫ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। ঐতিহাসিক এই সাক্ষাতের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে বলতেন, করমর্দনের সৌভাগ্য লাভ করার সেই মুহূর্তটি আমার জীবনে পবিত্র পরিবর্তন সাধনের কারণ হয়েছে। প্রাইভেট সেক্রেটারি সাহেব হুযূর (রা.)-এর নিকট আমার পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, ইনি ক্বারী মুহাম্মদ আশেক সাহেব, তিনি একজন নও মোবাঈ তথা নবদীক্ষিত আহমদী। তিনি যখন আমাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন তখন হুযূর (রা.) স্নেহপরবশ হয়ে আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন আর আমিও হুযূর (রা.)-এর আশিসমণ্ডিত হাত ধরে তাঁকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করতে থাকি। ১৫ বছর পর্যন্ত তার ওপর পবিত্র রমযানে মসজিদে মুবারকে তারাবীহ্‌র নামায পড়ানোর দায়িত্ব ন্যস্ত হতে থাকে। নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ মার্কাযিয়া মওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেব একবার তাকে বলেছিলেন, আপনার ওপর বার বার মসজিদে মুবারকে তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ্‌র নামায পড়ানোর দায়িত্ব অর্পণ করার কারণ হলো, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) আপনার তিলাওয়াত অনেক পছন্দ করেন। তার বহু শিষ্য রয়েছে। তারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যারা তার গুণাবলী থেকে কল্যাণ লাভ করেছে এবং তার জ্ঞান থেকে কল্যাণমণ্ডিত হয়েছে। তাদের চিঠিপত্রও এসেছে। তারা তাকে স্মরণ করে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার সন্তানসন্ততি ও পরবর্তী প্রজন্মের মাঝেও তার বাসনা অনুসারে দোয়া ও নিষ্ঠার সৃষ্টি করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হলো শ্রদ্ধেয় নূরুদ্দীন আল হুসনি সাহেবের যিনি সিরিয়ার অনেক পুরোনো একজন আহমদী ছিলেন। ইদানিং সৌদি আরবে অবস্থান করছিলেন। আহমদী হওয়ার কারণে বেশ কয়েক বছর ধরে সৌদি আরবের একটি জেলে বন্দি ছিলেন। তিনি

আসীরে রাহে মওলা তথা আল্লাহ্‌র পথে কারাবন্দি ছিলেন। বিভিন্ন অসুস্থতা ও কঠোরতা সত্ত্বেও ঈমানের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। অবশেষে এই বন্দিদশাতেই তিনি গত ৫ মে প্রায় ৮২ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

তার পিতা আলহাজ্জ আব্দুর রউফ আল হুসনি সাহেব ১৯৩৮ সনে বয়আত করেছিলেন। সিরিয়া জামা'তের সাবেক আমীর জনাব মুনিরুল হুসনি সাহেব মরহুম নূরুদ্দীন আল হুসনি সাহেবের জ্যাঠা ছিলেন। মরহুম বাল্যকাল থেকেই ইসলামী স্বভাবচরিত্র এবং খিলাফতের ভালোবাসাপূর্ণ পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছেন। তার পিতার মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ১৩ বা ১৪ বছর। মরহুম অধিকাংশ সময় জনাব মুনিরুল হুসনি সাহেবের সংস্পর্শে অবস্থান করতেন। তার কাছ থেকে তিনি জামা'ত সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছেন। ১৯৫৫ সনে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যখন দামেস্কে যান তখন তিনি মরহুমের চাচা জনাব বদরুদ্দীন আল হুসনি সাহেবের বাড়িতে উঠেছিলেন। সেই দিনগুলোতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর সম্মুখে তিনি একবার কুরআন তিলাওয়াত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি অনেক রোযা রাখতেন। সোমবার ও বৃহস্পতিবারে তিনি বিশেষভাবে রোযা রাখতেন। কুরআন তিলাওয়াত করার প্রতি তার গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি কখনোই তাহাজ্জুদের নামায বাদ দিতেন না। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত কারাগারেও তিনি নিজের ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং জামা'তের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখেন। এ বিষয়ে তার ঈমান ছিল যে, আল্লাহ্‌র সাহায্য সন্নিকটে; একথা তিনি তাদের সবাইকে বলতেন যারা তার সাথে সাক্ষাৎ করতে কারাগারে যেতেন। তার অবর্তমানে তিনি বিধবা স্ত্রী রেখে গেছেন। তিনি আহমদী নন, তবে তিনি তার স্বামীর সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রেখেছেন, তার কারাজীবনের দিনগুলোতে এই মহিলা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তার সন্তানদের মধ্যে ৩জন পুত্র রয়েছে। আব্দুর রউফ আল হুসনি সাহেব, মুহাম্মদ মুআযুল হুসনি এবং ফুয়াযুল হুসনি ছাড়াও এক কন্যা সন্তান রয়েছে, তার নাম যয়নাবুল হুসনি। পৌত্র-পৌত্রীও রয়েছে আর তারা সবাই আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় নিষ্ঠাবান আহমদী।

মরহুমের পুত্র মুআযুল হুসনি সাহেব বলেন, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা চাইতেন আমরা সব ভাইবোন যেন পুরো আশ্বস্ত হয়ে জামা'তভুক্ত হই। আলহামদুলিল্লাহ্, আমরা পূর্ণ ঈমানের সাথে বয়আত করেছি। সৌদি আরবে থাকার সময় তিনি জামা'তের সন্ধান করতে থাকেন। পরবর্তীতে যুক্তরাজ্যের অধিবাসী মরহুম হাসেম সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ হয় যিনি সেখানে কাজ করতেন। তিনি বলেন, আমাদের পিতা জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জামা'তের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। অত্যন্ত দয়ালু ও খোলা মনের মানুষ ছিলেন। অন্যদের সাহায্য করা তার পছন্দনীয় বিষয় ছিল। তিনি আরও লিখেন, ২০১৯ সনে তাকে ডেকে নিয়ে কারাবন্দি করা হয়। অনেক চেষ্টা ও খোঁজখবর করার পর জানা যায়, আমার শ্রদ্ধেয় পিতার বিরুদ্ধে আহমদী হওয়া এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তবলীগ করার অভিযোগ রয়েছে। তিনি বলেন, দুই বছর পর্যন্ত আমরা তার মুক্তির সব ধরনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা করি। বেশ কয়েকজন উকিলের সহায়তা নেয়া হয়। তার মুক্তির আদেশও জারি হয় আর তা কার্যকরও হয়, কিন্তু মুক্তি দেয়ার কয়েক ঘন্টা পরই পুলিশ তাকে ফোন করে থানায় ডাকে এবং পুনরায় তাকে গ্রেফতার করে। এবার তার ওপর পূর্বের তুলনায় বেশি কঠোরতা করা হয়। তার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি ছিল না আর ফোনে কথা বলারও অনুমতি পাওয়া যায়নি। তার স্বাস্থ্য

খারাপ ছিল। রোগ ও বার্ধক্যের কারণে তিনি অসুস্থ হতে থাকেন আর হাসপাতালেও যেতে থাকেন, কিন্তু তার পরিবারের লোকদের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়নি।

তার বড় পুত্র আব্দুর রউফ আল হুসনি কানাডায় বসবাস করেন। তার সম্পর্কে তিনিও লিখেন যে, জামা'তের প্রতি তিনি অনেক নিষ্ঠাবান ও আন্তরিক ছিলেন। নিজের ধর্মবিশ্বাসের ওপর তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনিও তার ইবাদত-বন্দেগী ও নিষ্ঠার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি কিছুটা বিস্তারিত লিখেছেন। অর্থাৎ ২০১৬ সালে তাকে যখন গ্রেফতার করা হয় তখন তিনি রোযা রেখেছিলেন, কিন্তু বন্দিদশায় তাকে অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হবে তা জানা সত্ত্বেও তিনি রোযা ভাঙা পছন্দ করেননি। অফিসার তাকে পানি দিলে তিনি বলেন, আমি রোযাদার। আসর নামায পড়ার অনুমতি চাইলে সে অনুমতি দিয়ে দেয়। তিনি তার সামনেই নামায পড়েন। তখন সে বলে ওঠে, আপনারা দেখছি আমাদের মতোই নামায পড়েন। যাহোক তার ওপর এর গভীর প্রভাব পড়ে, ফলে তখন তাকে সে ছেড়ে দেয়। পরে ২০১৯ সনে পুলিশ কোনো কারণ উল্লেখ না করেই পুনরায় তাকে গ্রেফতার করে কারাবন্দি করে নেয় আর এই কারাবন্দি অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন এবং তার পদমর্যদা উন্নীত করুন। তার সন্তানসন্ততিকেও তার বিভিন্ন পুণ্য ও গুণাবলী অবলম্বনের তৌফিক দান করুন। নামাযের পর আমি জানাযার নামাযও পড়াবো, ইনশাআল্লাহ্।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)